সমকাল

তারিখ ... 19 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2 ...

পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা-সম্পর্ক ছিন্ন যে কারণে জরুরি ছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বাহিনী কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের নয়; সাধারণ নিরীহ বাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুর ওপর গণহত্যা বলতে যা বোঝায় তা-ই সংঘটিত করেছিল। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি; মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের দামাল সন্তানদের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল তাদের। ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের পর তাদের বন্দি করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গণহত্যা, ধর্ষণসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ১৯৫ সেনা অফিসারের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের সম্মতিক্রমে ত্রিপক্ষীয় শিমলা চুক্তির আওতায় বন্দি এক লাখেরও বেশি সেনা সদস্যকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। পরে পাকিস্তান সরকারেরই গঠিত বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনেও যুদ্ধাপরাধের দায়ে ওই সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের সুপারিশ করা হয়। এর পর ৪৪ বছর পার হয়ে গেলও সেই বিচার তারা শুরুই করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর কুখ্যাত রাজাকার-আলবদর ও আলশামস বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার বিলম্বে হলেও শুরু করেছি। ইতিমধ্যে চিহ্নিত কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর বিচার, দণ্ডাদেশ ও রায় কার্যকরও হয়েছে। তার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের সংসদ, সরকার ও রাজনীতিকরা শুরু করেছে নির্জলা মিথ্যাচার। এমনকি তারা ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে জানিয়ে দিয়েছে– একাত্তরে বাংলাদেশে কোনো গণহত্যাই সংঘটিত হয়নি। আমি মনে করি, একাত্তরের বর্বরোচিত গণহত্যার পর পাকিস্তানের আজকের অবস্থান হচ্ছে 'বর্বরোচিত মিথ্যাচার'। বস্তুত পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব এত বড় ও বিশ্ববিদিত গণহত্যা একেবারেই অস্বীকার করা।

এমন মিথ্যাচারের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নিশ্চুপ বসে থাকা সম্ভব নয়। এই সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে হামলার মধ্য দিয়ে বিশ্বের ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার সূচনা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। এর ধারাবাহিকতায় তারা ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ নিয়েছে, তিন লাখের বেশি মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে; আহত ও স্বজনহারা করেছে কোটি কোটি মুক্তিকামী বাঙালিকে। আবার বাঙালির কাছে বেদম প্রত্যাঘাত খেয়ে আত্মসমর্পণের মাত্র দু'দিন আগে তারা গণহত্যার শেষ অধ্যায়টিও সংঘটিত করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম নির্যাতন শেষে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের অনেকের লাশ আমরা বিজয়ের পর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পেয়েছি; অনেকের লাশ এখনও পাওয়া যায়নি। ২০১৫ সালে এসে পাকিস্তানের পক্ষে একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে মিথ্যাচারের পর নীরব থাকার অর্থ তাদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তা পারে না। এ পর্যায়ে নিশ্চুপ থাকার অর্থ হচ্ছে, ৩০ লাখ শহীদের অসম্মান করা।

ইতিহাস সাক্ষী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সত্য, ন্যায় ও মুক্তির লড়াইয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী থেকেছে। পাকিস্তানের মিথ্যাচারের পরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বক্তব্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়– এখন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র বা শিক্ষক প্রতিনিধি দল পাকিস্তানে পাঠানো হবে না। পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি দল এলেও তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হবে না। পাকিস্তানের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড এখন থেকে স্থগিত থাকবে। তারা একাত্তরের গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে যেন সব ধরনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়। সার্ক ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকেও পাকিস্তানকে গণহত্যার দায়ে বহিষ্কারের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের দাবি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আসলে একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা বাংলাদেশে বর্বরোচিত গণহত্যা, গণহত্যামূলক ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনের জন্য দায়ী একটি দেশের সঙ্গে কখনোই স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না– পাকিস্তানের সাম্প্রতিক জঘন্য মিথ্যাচারই তার প্রমাণ। যারা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, সুযোগ পেলে এখনও করতে চায়, তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসক ডা. ডেভিস বাংলাদেশে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের ধর্ষণের শিকার নারী বা বীরাঙ্গনাদের ওপর যে চিকিৎসা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, ভারতীয় সাংবাদিক অমৃতা মালিক আমাদের বিজয়ের পরপরই ঢাকায় এসে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, তাতে একজন পাকিস্তানি সৈন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে– "আমরা চলে যাচ্ছি; কিন্তু আমাদের 'বীজ' রেখে গেলাম।" মা-বোন তথা বাঙালি জাতির এই অপমান আমরা কীভাবে ভুলব?

মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা ৪৪ বছর পার হয়ে এসেছি; কিন্তু এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশে এখনও পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের বিচরণ দেখা যায়। যুদ্ধাপরাধের দায়ে পাকিস্তানের দোসরদের বিচার বিলম্বিত হয়েছে বলেই তারা সদম্ভে বিচরণ করছে স্বাধীন বাংলাদেশে। প্রভু ও দোসর– উভয় অংশই মেতেছে মিথ্যাচারে। বাংলাদেশে এই পাকিস্তানিকরণের সূচনা করেছিলেন দেশের প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও তার দোসরদের যে ঔদ্ধত্য সূচিত হয়েছিল, পাকিস্তানের মিথ্যাচার তারই অংশ। এই সময় বাংলাদেশের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি জেগে না ওঠে, তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য ও মিথ্যাচার আরও বেড়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই মিথ্যার বিরুদ্ধে, সত্যের পক্ষে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে নিজের মাথা সমুন্নত রাখতে দ্বিধা করেনি। বঙ্গবন্ধুর কলঙ্ককজনক হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সভাতেই সর্বপ্রথম এর নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব পাস করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও কর্মের প্রতি জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদী বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব বাতিলের যে অন্যায় করেছিল; এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ২০১০ সালে তার ছাত্রত্ব বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করে বহু আগের সেই অন্যায় শুধরে নেয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী বরকতসহ ছাত্র-জনতা মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন উৎসর্গ করে বিশ্বের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গের সেই ঘটনা পৃথিবীতে প্রথম দৃষ্টান্ত বলে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সূচনাপর্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রবাসে থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কারাগারে গেছেন, তবু পাকিস্তানের প্রেতাত্মা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপস করেননি।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এসে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনেই একটি বটগাছ রোপণ করে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও তিনি ভারতে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন এবং তদানীন্তন মার্কিন সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও সিনেটে বাংলাদেশে গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আত্মত্যাগের অসাধারণ কথা জানতেন বলেই ফরাসি দার্শনিক আঁদ্রে মালরো স্বাধীনতার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভাষণে বলেছিলেন– 'আমি আজ এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দিতে এসেছি, যেখানে জীবিত ছাত্রছাত্রীর তুলনায় জীবন উৎসর্গকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।'

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা-শিক্ষকের ওপর পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল এলাকা, ফুলার রোডের আবাসিক এলাকা, শামসুন্নাহার হলের পাশে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের গণকবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে রয়েছে শত শহীদের নামফলক। এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেনি– এমন দাবি প্রতিদিনের সূর্যোদয়কেই অস্বীকারের শামিল। এমন দাবি আমাদের রক্তে রঞ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় তথা ৩০ লাখ শহীদের অবমাননার শামিল। বঙ্গবন্ধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্রত্ব হারিয়েছেন, কিন্তু আপস করেননি, দার্শনিক জিসি দেব যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবেসে বিদেশের আকর্ষণীয় বৃত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন ও প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মিথ্যাচার নির্বিবাদে মেনে নেবে?

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্য সমুন্নত রাখার লড়াই চালিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও আমরা পিছপা হইনি; কখনও হবো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্যই যেখানে সত্যের অন্বেষা ও প্রতিষ্ঠা, সেখানে একটি জাজ্বল্যমান সত্যকে অস্বীকার করা একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি? পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হতে পারত আদান-প্রদান। আমরা একটি মিথ্যাচারী দেশে শিক্ষার্থীদের পাঠিয়ে কী আদান-প্রদান করব? আমরা দেখেছি, পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি দল এসে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যার স্মারক ও স্মৃতি দেখেছে, তারা অবাক হয়েছে। তাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকে একাত্তরের গণহত্যার কোনো উল্লেখই নেই! তাদের কাছে আমাদের শিক্ষার্থীরা কী শিখতে যাবে? অনেকে বলছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা-সম্পর্ক ছিন্ন হলে উর্দু বিভাগের কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে। তাদের উদ্দেশে বলি– এতে বরং কার্যক্রম আরও বেগবান হবে। কারণ উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রধান ভাষা নয়। বরং উর্দুর ঐতিহ্য ও চর্চা ভারতে বেশি। আমরা সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম আরও বাড়িয়ে দেব।

বড় কথা হচ্ছে, যে দেশ আমাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে, আমাদের সম্ভ্রমহানি করেছে এবং এত বছর পরও সেইসব অন্যায়ের বিচার দূরে থাক, অনুশোচনা দূরে থাক, ক্ষমা প্রার্থনা দূরে থাক; বরং নির্লজ্জ অস্বীকৃতি জানাচ্ছে– সেই দেশের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্ক তো বটেই, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, ক্রীড়া এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদই শ্রেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা-শিক্ষকের ওপর পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল এলাকা, ফুলার রোডের আবাসিক এলাকা, শামসুন্নাহার হলের পাশে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের গণকবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে রয়েছে শত শহীদের নামফলক। এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেনি– এমন দাবি প্রতিদিনের সূর্যোদয়কেই অস্বীকারের শামিল। এমন দাবি আমাদের রক্তে রঞ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় তথা ৩০ লাখ শহীদের অবমাননার শামিল